লোকবাদ কাকে বলে?

মইদুল ইসলাম

রাজনৈতিক তত্ত্বের কর্মকাণ্ডে ইংরেজি ভাষায় আজকাল 'পপুলিজম' নিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে কলকাতা নিবাসী এক প্রবীণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর উদ্যোগে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষা' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ে পপুলিজমকে 'লোকবাদ' ও পপুলারকে 'জনপ্রিয়' এবং 'লোকায়ত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পপুলিজমকে তাই আমরা লোকবাদ ও জনপ্রিয়তাবাদ এই দুই শব্দবন্ধ দিয়ে চিহ্নিত করব। অন্যদিকে 'পপুলিস্ট' শব্দের বাংলা অনুবাদ তিন ধরনের হতে পারে : (১) লোকবাদী (২) জনপ্রিয়তাবাদী এবং (৩) জনমোহিনী। ইদানীং রাজনৈতিক পণ্ডিতরা ইংল্যান্ডে ব্রেক্সিট ভোট, আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনকে জনপ্রিয়তাবাদের উত্থান হিসেবে দেখেছেন। লাতিন আমেরিকাতেও বহু দেশে জনপ্রিয়তাবাদের রমরমা দেখা গেছে এবং এখনও ওই মহাদেশে জনপ্রিয়তাবাদের জনপ্রিয়তা বেশ কায়েম আছে বলে অনেক রাজনীতি বিশারদ মনে করেন। আমাদের দেশে নরেন্দ্র মোদীর উত্থান বা পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর রাজনীতিকে জনমোহিনী রাজনীতি ও তৃণমূল দলকে অনেকে জনপ্রিয়তাবাদী দল বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু লোকবাদ বা জনপ্রিয়তাবাদ কি একটি বিশেষ রকমের আন্দোলন বা আবেগ অথবা মতাদর্শ? লোকবাদী দল ও সরকারের পিছনে কি কোনো বিশেষ ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণির সমর্থন থাকে? লোকবাদ কি কোনো বিশেষ গোষ্ঠী ও শ্রেণিস্বার্থ পূরণ করে? জনতা বা জনগণ বলতে আসলে আমরা কী বুঝি আর জনপ্রিয়তাবাদের তত্ত্বের নিরিখে জনগণ বা জনতা কী? এই প্রবন্ধে উপরে উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজব।

রাজনৈতিক তত্ত্বের নিরিখে লোকবাদ

লোকবাদ নিয়ে রাজনৈতিক তত্ত্বের সবথেকে প্রধান, যথাযথ এবং বাস্তবধর্মী তাত্ত্বিক হলেন আর্নেস্তো লাকলাউ। তাই তাঁর লেখার ভিত্তিতে আমরা লোকবাদ নিয়ে আলোচনা করব। প্রধানত লাকলাউয়ের 'ওন পপুলিস্ট রিজন' বইটির কয়েকটি তাত্ত্বিক দিক ও বাস্তব রাজনীতির কিছু উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা হবে এই প্রবন্ধে। উল্লিখিত বইতে লাকলাউ খুব পরিস্কার করে বলে দিচ্ছেন যে লোকবাদ কোনো বিশেষ আন্দোলন বা আবেগ অথবা মতাদর্শ নয়। লোকবাদী দল ও সরকারের পিছনে কোনো বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণির সমর্থন থাকে না। লোকবাদ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটা বৃহত্তর জনসমাবেশ গঠন করা সম্ভব। সেদিক থেকে লোকবাদ বা জনপ্রিয়তাবাদ হল জনতা বা জনগণের একটা ধারণা গঠন করার রাজনৈতিক কৌশল যা ক্ষমতার বিপরীতে থাকবে এবং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, স্বার্থ, সরকার বা দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। লোকবাদ এমন একটি জনসমাগমের রাজনৈতিক কৌশল যা বিভিন্ন রকমের শ্রেণি, গোষ্ঠী, জাত, লিঙ্গ, ভাষার মানুষকে একত্রিত করতে সক্ষম। তাই দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী মতাদর্শের রাজনীতি নির্বিশেষে লোকবাদ হয়। লোকবাদ ছাড়া বড়ো রাজনৈতিক সমর্থন যেকোনো দল বা আন্দোলনের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই লাকলাউ লোকবাদকে রাজনীতির একটি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য যুক্তি হিসেবে দেখেন। কোনো বিশেষ ধরনের আন্দোলন, দল বা মতাদর্শ হিসেবে নয়। তাই রাজনীতি থাকলে লোকবাদও থাকবে। রাজনীতির সঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

জনগণের সমাগম ও জনমোহিনী রাজনীতির একদম প্রাথমিক ভিত্তি হল 'দাবি'। তাই যেকোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দিক থেকে গোষ্ঠী হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হল দাবি। এক বিশেষ ধরনের দাবিকে সামনে রেখে কিছু মানুষ একত্রে আসে এবং কোনো একটি গোষ্ঠীর গঠন হয়। তাই রাজনৈতিক যুক্তির বিচারে গোষ্ঠী কোনো প্রদত্ত পরিচিতির উপর নির্মিত নয় বরং লাকলাউয়ের মতে তার গভীর ও মৌলিক ভিত্তি হল দাবি। পরিচিতি বা নামের অবশ্য গুরুত্ব আছে গোষ্ঠীর গঠনের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাথমিক স্তরে এক বা একাধিক দাবি পেশের মাধ্যমে

গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে দলিত মানুষ বা সম্প্রদায়ের কথা। যাকে আমরা দলিত মানুষ বলে জানি তা সামাজিক স্তরে অনেকগুলো জাতি দ্বারা বিভাজিত। ভারতীয় সংবিধানেও দলিত শব্দের বদলে শিডিউলড কাস্টস শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দলিত মানুষের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন জাতিভেদ থাকলেও কয়েকটি প্রধান দাবিকে সামনে রেখে বহু জাতিবিভক্ত অনেক মানুষ যারা আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডে পিছিয়ে, চতুর্বর্ণীয় হিন্দু সমাজের বাইরে অবস্থিত ও উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের বৈষম্য, নিপীড়ন, নিষ্পেষণ, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'দলিত' নামক শব্দবন্ধ ও রাজনৈতিক সত্তার পতাকাতলে একসঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে পেরেছে। সেই দাবিগুলোর অন্যতম ছিল দলিতদের মন্দিরে ঢোকার দাবি এবং আর পাঁচটা উচ্চবর্ণীয় মানুষের মতো একই মন্দিরে পুজো করার স্বাধীনতার দাবি। তা ছাড়া অস্পৃশ্যতা বিলোপ করার দাবি এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের দাবিকে কেন্দ্র করে এক 'দলিত মানুষের' ধারণাকে নির্মাণ করা সম্ভব হল যা আদতে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। উপরে উক্ত দাবিগুলোকে কেন্দ্র করে যেমন দলিত জনতার নির্মাণ হল তেমন বিভিন্ন জাতি যথা চণ্ডাল, মহার, বাউড়ি, বাগদি, পৌন্ড্র, নমঃশূদ্র, ডোম, পাটনি, চামার ইত্যাদির মতো আরও শত শত জাতে বিভক্ত এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছড়িয়ে থাকা ওই মানুষগুলোকে দলিত নামে (যার আক্ষরিক অর্থ বিদীর্ণ, বিচ্ছিন্ন, দমিত ইত্যাদি) সম্বোধিত করার যে প্রেক্ষাপট তৈরি হল তার ভিত্তি ছিল কিছু দাবি।

এবার আসা যাক দাবিগুলোকে কার কাছে পেশ করা হচ্ছে সেই বিষয়ে এবং দাবি রচনার পরের ধাপ প্রসঙ্গে। দাবি তোলার মধ্যে কেবল রাজনীতি থেমে থাকে না। দাবিকে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত করতে হয় কোনো একটি ক্ষমতাধর বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে। এই ক্ষমতাধর— ক্ষমতাশীল ব্যক্তি বা শাসক গোষ্ঠী অথবা সরকারও হতে পারে। দাবি কিন্তু প্রথমে একটি অনুরোধের পর্যায়ে থাকে। সেই অনুরোধ যদি মেনে নেওয়া হয় এবং তদুপরি প্রাথমিকভাবে সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে দাবি পূরণ করা হয় তাহলে আর কোনো সমস্যা রইল না। কারণ ব্যাপারটা তখনই চুকে গেল। তাই দাবি পূরণের মাধ্যমে ওই বিশেষ সন্ধিক্ষণে রাজনীতির আর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রাজনীতির সম্ভাবনা তৈরি হয় যদি কোনো দাবিকে না মানা হয়। কারণ কোনো একটি বিশেষ দাবি না মানার ফলে বৃহত্তর জনসমাজে সেই ক্ষমতার বৃত্ত সামনে চলে আসে যে বা যারা দাবি মানেনি। অর্থাৎ একটা বৈরিতার সীমানা তৈরি হয় যেখানে কিছু মানুষের দাবি একদিকে আর ক্ষমতাধর ব্যক্তি, দল বা শাসক অন্যদিকে। যেই মাত্র একটি দাবিকে মানা হল না তখন সেই দাবি একটা অপূর্ণতার রূপ বা অপূরণীয় দাবি বলে গণ্য হল। হয় সেই অপূর্ণ দাবি মেটাবার জন্য আরও বড়ো আকারের বিক্ষোভ, আন্দোলন, প্রতিবাদ, সংগ্রাম ইত্যাদি সংগঠিত করার একটা সুযোগ থাকবে অর্থাৎ দাবি পূরণের রাজনীতির সম্ভাবনা তৈরি হবে অথবা অনেকগুলো অপূর্ণ দাবির মিলনক্ষেত্র হিসেবে একটা বৃহত্তর জনআন্দোলনের সম্ভাবনা থাকবে। এই বৃহত্তর জনবিক্ষোভের পটভূমি গড়ার পিছনে জনমোহিনী রাজনীতির প্রক্রিয়া কাজ করে যেখানে বহু অপূর্ণ দাবি এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্র, সরকার, ক্ষমতাসীন স্বার্থ, ক্ষমতাধর ব্যক্তি ইত্যাদিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

গণতান্ত্রিক দাবি ও জনপ্রিয় দাবি

লাকলাউ যেকোনো দাবিকে গণতান্ত্রিক দাবি বলে চিহ্নিত করেন। কারণ দাবি কোনো একটি অসহায় ও অবহেলিত মানুষ করছেন একটি বিশেষ মুহূর্তে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তি বা শাসকের কাছে। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক দাবি বা দাবিসমূহকে অন্যান্য দাবিগুলোর থেকে আলাদা করে গ্রাস বা পূরণ করার সামর্থ্য রাখে ক্ষমতার বৃত্ত। কিন্তু অনেকগুলো অপূর্ণ দাবিসমূহকে একত্রিত করা ও সামঞ্জস্য রূপ দেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি জনপ্রিয় দাবি বা জনপ্রিয় দাবিসমূহতে পরিণত হয়। তাই জনপ্রিয় দাবি ক্ষমতার বৃত্তকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দ্বন্দ্বযুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। গণতান্ত্রিক দাবি আর জনপ্রিয় দাবির প্রধান তারতম্য হল প্রথমটি ক্ষমতাসীন বৃত্ত পূরণ করার সামর্থ্য রাখে আর দ্বিতীয়টি ক্ষমতাসীনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবার সামর্থ্য রাখে।

গণতান্ত্রিক দাবির সঙ্গে লাকলাউ 'বিভিন্নতার যুক্তি'-র যোগ দেখেন যেখানে ক্ষমতাসীন বৃত্ত গণতান্ত্রিক দাবিকে অন্য আরো কিছু গণতান্ত্রিক দাবির থেকে আলাদা করে পূরণ করতে পারে। ধরা যাক বাংলায় ডাক্তারদের কোনো সমস্যা হয়েছে এবং ডাক্তাররা কয়েকটি দাবিকে সামনে রেখে বিক্ষোভ করছে, ধর্মঘটে গেছে, কর্মবিরতি পালন করছে। এই চিত্র জুন মাসে ডাক্তারদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলার মানুষ দেখেছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন বৃত্ত (এখানে বঙ্গের রাজ্য সরকার) তাদের দাবিগুলোকে মেনে নিল এবং তাদের সমস্যা নিরসনের পথ অবলম্বন করল। তাদের দাবিগুলোকে মেনে নিয়ে একদিকে যেমন অন্য অনেক পেশার দাবিসমূহ থেকে আপাতত ডাক্তারদের দাবিকে আলাদা করে প্রাধান্য দেওয়া হল তেমনি অন্য পেশার মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে একসঙ্গে জোটবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে রহিত করা গেল। যেমন গত কয়েক বছর ধরে বাংলায় ডাক্তারদের মতো স্কুলশিক্ষক, কলেজ-

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পুলিশকে অনেকসময় গুন্ডামি এবং শারীরিক নিগ্রহ ও আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। ডাক্তারদের নিরাপত্তার মতো শিক্ষক সমাজ এবং পুলিশের নিরাপত্তার সংশয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমে গত কয়েক বছর বহুবার আলোচনা হয়েছে। তা ছাড়া সরকারি ডাক্তারদের সঙ্গে সরকারি চাকুরে এবং বাংলার শিক্ষক সমাজের বেতন কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের থেকে কম। কিন্তু ডাক্তারদের আন্দোলনের সঙ্গে অন্য পেশার নিরাপত্তা জনিত দাবি এবং বেতন কাঠামোর উন্নতির দাবিসমূহকে কেন্দ্র করে সরকারবিরোধী কোনো জনপ্রিয় দাবিতে ত্বরান্বিত হল না, কোনো জনপ্রিয় সরকার বিরোধী গণআন্দোলন হল না। অন্যদিকে জনপ্রিয় দাবির সঙ্গে লাকলাউ 'সমানতার যুক্তি'র যোগ দেখেন যেখানে অনেকগুলো অপূর্ণ দাবিসমূহকে সমতা ও তুল্যতার বেষ্টনীতে বেঁধে কিছু অপূর্ণ দাবির মধ্যে একটি সংহতি তৈরি হয় ক্ষমতাসীন বৃত্তের বিরুদ্ধে। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে জনগণ বা জনতার উন্মেষ হয় একটি সমষ্টিগত বা যৌথ রাজনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে। এই জনগণ কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণির দ্বারা গঠিত নয়। বরং বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনেক মানুষের দাবিকে সামনে রেখে একটি জনসমষ্টি। অনেকগুলো অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবি একযোগে যখন একটি জনপ্রিয় দাবির রূপ নেয় সেই জনপ্রিয় দাবিকে একটি বলিষ্ঠ জনপ্রিয়তাবাদী শক্তিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে অনেকসময় জনপ্রিয় স্লোগান, জনপ্রিয় রাজনৈতিক ধারণা (গণতন্ত্র, সমতা, ন্যায়, শান্তি, সম্প্রীতি, ইত্যাদি) অথবা কোনো নেতা বা নেত্রী এবং তাঁর নাম বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ধরা যাক ১৯৭৭ এবং ২০১১-তে বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের কথা।

লোকবাদ এবং বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল

১৯৭২-১৯৭৭ সময়কালে বাংলায় এক অভূতপূর্ব অচলাবস্থা চলছিল। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতা কিছুটা সংকুচিত। বামপন্থীরা সেই সময়ের সরকারকে একটা স্বৈরাচারী ও আধা-ফ্যাসিস্ট সরকার বলত। কৃষক দুর্দশা চরমে। কৃষক দাবিকে কেন্দ্র করে নকশালবাড়ি আন্দোলন হয়েছে। শ্রমিকদের অবস্থা তথৈবচ। বেকারত্ব বাড়ছে। মধ্যবিত্ত চাকুরে থেকে শিক্ষাকুল, প্রত্যেকের মাইনে তার পরের দশকগুলোর তুলনায় বেশ অল্প। আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ কারণ রাজনৈতিক হিংসা এবং বিভিন্ন রকমের গুন্ডামি ও অপরাধ প্রায় লেগেই রয়েছে। কালোবাজারি ও দুর্নীতির রমরমা নিয়ে অভিযোগ উঠছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বেহাল দশা। ১৯৭১-এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে আগত নতুন উদ্‌বাস্তু রাজ্যের পরিকাঠামোর উপরে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করার ফলে পরিকাঠামো ব্যবস্থা একদিকে যেমন নড়বড়ে তেমনি সেই নতুন উদ্‌বাস্তুদের পাশে দাঁড়াবার দাবি সামনে চলে এসেছে। পরীক্ষায় গণটোকাটুকির অভিযোগ উঠছে। পরীক্ষার ফল এক বছর বা দু-বছর পর বেরোচ্ছে। এমার্জেন্সির সময়কাল— ২৬ জুন ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ ১৯৭৭ পর্যন্ত অবস্থা বেশ ভয়াবহ। এইসবের মধ্যে বিভিন্ন বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ফলে জনসমাজে তৎকালীন বাংলার সরকারের একটি স্বৈরাচারী ও অপদার্থতার ভাবমূর্তি তৈরি হল ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের আগে। এরকম একটা প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের নামে বামফ্রন্ট ভোট চাইল। বিপুল ভোটে বামফ্রন্ট জিতল। সেই জনাদেশ কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শপথ ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য বৃহত্তর মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় উন্মাদনা তৈরি করতে পেরেছিল। সেইসময় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গণতন্ত্রের মানে ছিল পরীক্ষাব্যবস্থার অনিয়মকে দূর করা। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাকুল তথা সমাজের এক বড়ো অংশের কাছে বাক্-স্বাধীনতা পূর্ণভাবে ফিরে পাওয়া। মধ্যবিত্ত-র কাছে আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ উন্নত হওয়া ও সামাজিক সুস্থিতি। কৃষকের কাছে লাঙ্গল যার জমি তার স্লোগানকে বাস্তবায়িত করা এবং শ্রমিকের কাছে তার অধিকার ফিরে পাবার নাম ছিল গণতন্ত্র। অর্থাৎ 'গণতন্ত্র' এক একটি গোষ্ঠীর কাছে এক এক রকম মানে। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের নামে তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণির এক তাৎপর্যপূর্ণ মানুষ বামফ্রন্টকে ভোট দিয়ে এক জনপ্রিয় দাবি পূরণ করেছিল। সেই জনপ্রিয় দাবি ছিল একটি স্বৈরাচারী ও অযোগ্য সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা। এখানে মনে রাখতে হবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের জয় শুধু শ্রমিক শ্রেণির জয় ছিল না যদিও কমিউনিস্টরা মনে করেন যে আদতে তারা শ্রমিক শ্রেণির পার্টি। জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির নিরিখে ১৯৭৭ সালের জয় একটি অবহেলিত ও দমিত জনগণের জয় ছিল। অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি একটি জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সফল করতে পেরেছিল।

বাংলায় ২০১১ সালের নির্বাচনকে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে 'পরিবর্তন' স্লোগানের জনপ্রিয়তা একটা বৃহত্তর জনগণ/জনতা নির্মাণ করতে সফল হয়েছিল। কিন্তু একইসঙ্গে 'পরিবর্তন' নামক শব্দবন্ধ বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে আলাদা মানে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৃষক সমাজের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশের মানুষের কাছে মনে হয়েছিল, রাজ্যে শাসক দলের পরিবর্তন হলে তাদের থেকে বলপূর্বক জমি নেওয়া হবে না। কৃষক সমাজের একটা অংশ মনে করল, যে সরকার একদিন ভূমি সংস্কার ও বর্গাব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মধ্যে জমি বণ্টন করেছিল তারাই যদি আজ জমি কাড়তে উদ্যোগী হয় তাহলে সেই সরকারকে বদল করে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। সিঙ্গুর,

নন্দীগ্রাম, নেতাই এবং লালগড় আন্দোলনের সময়ে শাসনযন্ত্র যেভাবে বহু মানুষের উপর দমন-পীড়ন-নির্যাতন করেছিল তার থেকে রেহাই পেতে বা সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন বহু মানুষ চাইছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অনেকে মনে করল বামফ্রন্ট আমলে তারা আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকল। সাচার রিপোর্টে বিশেষ করে শিক্ষা এবং সরকারি চাকরির মাপকাঠিতে বাংলার মুসলিমদের বেশ অনগ্রসরতা প্রকাশ পেল এবং তারা অনেকেই সেই অবস্থার একটা পরিবর্তন দরকার বলে মনে করল। বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্তের একাংশ মনে করল যে যোগ্যতা ও মেধার তুলনায় বামফ্রন্ট আমলে একদিকে পার্টিতন্ত্রের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে যেখানে পার্টির ক্যাডারদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা থেকে শুরু করে সরকারি চাকরি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। নাগরিক জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে, এমনকি ব্যক্তিগত পরিসরে পার্টির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। সঙ্গে ছিল কয়েকটি আর্থ-সামাজিক মাপকাঠিতে বাংলা কয়েকটা বিষয়ে জাতীয় স্তরে পিছিয়ে থাকার কাহিনী। যেমন বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে, ২০১১ আদমশুমারির হিসেবে বিদ্যুৎ যোগাযোগ, পরিশ্রুত পানীয় জল ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবার উপলব্ধি এবং টেলিভিশন কেনার ক্ষমতার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ, জাতীয় গড়ের থেকে পিছিয়ে ছিল। এহেন পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার যে বামফ্রন্ট আমলের প্রথম এক-দেড় দশকে ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, শ্রমিকের অধিকার, সরকারি চাকুরের মাইনে বৃদ্ধি ইত্যাদি নীতি থাকলেও শেষ দশকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বিচার করলে তেমন উন্নয়ন ঘটেনি। অর্থাৎ অপূর্ণ অনেক গণতান্ত্রিক দাবি পুঞ্জীভূত হয়েছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের পরবর্তীকালে সেই বিভিন্ন অপূর্ণ দাবির পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে থাকল ২০০৮ পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে। শেষে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের স্লোগান একটি জনপ্রিয় দাবিতে পরিণত হল যখন মানুষ ঠিক করল যে আর নয়, বামফ্রন্ট সরকারকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এবার সরকার পরিবর্তন দরকার।

লোকবাদ ও মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি রাজনীতি

সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নির্বাচনী কৌশল থেকে পরিষ্কার যে দলিত এবং শূদ্র (মূলত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) সম্প্রদায়ের মধ্যে 'হিন্দু পরিচিতির' নামে এক বিভাজনের চেষ্টা নির্বাচনে ফায়দা দিয়েছে। যেমন বিজেপি এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশের দলিত এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে উচ্চবর্ণের তুলনায় ভারতের মুসলমান আসলে বড় অপর, বিরোধী ও প্রতিপক্ষ। তার সঙ্গে আরএসএস-বিজেপি-র বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে একটি কল্পিত মুসলিম তাঁবেদারি ও তুষ্টিকরণের গল্প শোনানো হল। দলিত, আদিবাসী এবং শূদ্র তথা দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের কাছে মুসলিমদের ব্যাপারে বহু দশক ধরে একটা আখ্যান আরএসএস প্রচার করছিল। যার সারকর্ম হল মুসলিমদের ব্যাপারে সদা সন্দিহান থাকতে হবে কারণ তাদের পুণ্যভূমি ভারতে নয় এবং তাই তাদের দেশভক্তি ঠুনকো অথবা তারা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সন্ত্রাসবাদে মদত যোগায় এবং তাই তারা আদতে দেশের দুশমন। এই আখ্যানের সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই কারণ ভারতের মুসলিমদের মধ্যে একটি প্রবল সংখ্যাগুরু অংশের, আধুনিক ভারত গড়ার ক্ষেত্রে যে অবদান তা অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু দশকের পর দশক চলতে থাকা একটি মিথ্যা আখ্যানকে যদি প্রতিনিয়ত পালটা উপাখ্যান দিয়ে মোকাবিলা করা না হয় তাহলে জনমানসের কিছু অংশ একটি নির্মিত আখ্যানকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে।

অন্যদিকে আরএসএস-বিজেপি-র তরফ থেকে আরেকটি আখ্যান সমান্তরালভাবে প্রচার করা হল যে সামাজিক ন্যায়ের নামে কিছু পরিবারতান্ত্রিক দল কয়েকটি মুষ্টিমেয় জাতের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে; আসলে দলিত, আদিবাসী এবং শূদ্র সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষের তেমন উপকার হয়নি। আর এই অবস্থা জাতীয় স্তরে দশকের পর দশক টিকিয়ে রেখেছে উদারবাদী কংগ্রেস দল যাদের নেতৃত্ব একদিকে যেমন পরিবারতান্ত্রিক আর অন্যদিকে উচ্চশিক্ষিত, বিলাসী এবং সুবিধাভোগী শ্রেণি থেকে আগত। এই পুরাতন সুবিধাভোগী শ্রেণির স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে একদিকে দলিত, আদিবাসী, শূদ্র এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে উচ্চাভিলাষী নতুন মধ্যবিত্তর সমর্থন জোগাড় করতে বিজেপি সফল হল আবার বিজেপির প্রধান মুখ, নরেন্দ্র মোদীর দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসার কাহিনি গরিব মানুষের মধ্যেও সেই নেতার সঙ্গে একাত্মতার একটা জায়গা তৈরি করল। জনমোহিনী রাজনীতির নিরিখে বিচার করলে মোদীর জনপ্রিয়তা তাই একটি লোকবাদী রাজনীতির ফসল। সেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আপামর জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনেক মানুষকে নিয়ে গঠিত এমন একটা জনতার জন্ম দিয়েছে যারা পুরাতন উদারবাদী অথচ সুবিধাভোগী শ্রেণির বিরুদ্ধে একটা রাগকে প্রকাশ করছে এবং যারা প্রধানত পরিবারতান্ত্রিক ও তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার কংগ্রেসি ঘরানার রাজনীতির বিরুদ্ধে যা উদারবাদী ও সুবিধাভোগী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করেছে দশকের পর দশক।

এক্ষেত্রে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে 'সুদিন' ও 'সকলের সাথে সকলের বিকাশ' স্লোগান এবং ইউপিএ-২ জমানার শেষের দিকে নীতি পঙ্গুতার বিপরীতে মোদীকে জনমানসের সামনে একজন নির্ণায়ক নেতা হিসেবে তুলে ধরার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে মোদীত্বের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সফল হয়েছিল। নির্ণায়ক নেতার ভাবমূর্তি, মোদীর নিম্নবর্ণীয় জাত এবং দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসার আখ্যান, জনমুখী কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং তার সাথে পাকিস্তান ও সন্ত্রাসবাদকে জব্দ করার যে সামরিক জাতীয়তাবাদের একটা আখ্যান তুলে ধরা হল তা মোদীত্বের লোকবাদী রাজনীতিকে আবার অধিকতর সফল করল ২০১৯ লোকসভার নির্বাচনে। মোদীর লোকবাদী রাজনীতি আরও সফল হল যখন বিরোধীপক্ষ নির্বাচনি কৌশল এবং জোট বাঁধার ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত ও বিভাজিত ছিল। অন্যদিকে বিরোধীপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বড়ো রকমের জনআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি যা ইউপিএ-২ আমলে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল।

দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী লোকবাদ

আন্তর্জাতিক স্তরে কেবল বিশেষ ধরনের দাবিকে কেন্দ্র করে একটি মোটা দাগে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী লোকবাদের প্রভেদ করা হয়। যেমন বামপন্থী লোকবাদী রাজনীতির প্রধান দাবিগুলোর অভিমুখ হল পুনর্বণ্টন, বহুসংস্কৃতিবাদ বা বহুবৈচিত্র্যতা, সামাজিক ন্যায়, সামাজিক ঐকতান। এক্ষেত্রে লাকলাউয়ের প্রথম বই 'পলিটিক্স এন্ড ইডিওলজি ইন মার্কসিস্ট থিওরি'র চতুর্থ ও সর্বশেষ অধ্যায় 'টুওয়ার্ডস এ থিওরি অফ পপুলিজম'-এ উনি আরেকটু বিপ্লবী জনপ্রিয়তাবাদ বা সমাজবাদী লোকবাদের কথা বলেছিলেন। সেই ধরনের সমাজতান্ত্রিক জনপ্রিয়তাবাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের দমন এবং রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের অবলুপ্তি। লাকলাউয়ের সতীর্থ তাত্ত্বিক শান্তাল ম্যুফ আবার মনে করেন যে বামপন্থী জনমোহিনী রাজনীতি 'আশার' উপর দাঁড়িয়ে আর দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির ভিত্তি হল 'ভয়'। এই ভয় হল অভিবাসন-কেন্দ্রিক বিদেশাতঙ্ক। গত কয়েক বছর ইউরোপ ও আমেরিকাতে বিদেশিদের সম্বন্ধে অহেতুক ভয়কে অস্ত্র করে দক্ষিণপন্থী লোকবাদের উত্থান ঘটেছে বেশ কয়েকটি দেশে। তাই দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির প্রধান দাবি হল 'অভিবাসী ও বিদেশি তাড়াও'। দক্ষিণপন্থী লোকবাদ অভিবাসী সম্পর্কে নানারকম সন্দেহ ও ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করার রাজনীতি করে। দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির কারবারিরা তাই জনমানসে অভিবাসী সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা এবং গুজব ছড়ায় আর মনে করে যে অভিবাসীরা আসলে দেশজ জনগণের পরিচিতি সত্তার দ্রুত অবলুপ্তির কারণ হতে পারে। এছাড়া তারা মনে করে যে অভিবাসীরা দেশীয় শ্রমিকের কর্মসংস্থান কেড়ে নেয়। তাই তাদের দেশ থেকে তাড়ানো দরকার। অন্যদিকে বহুসংস্কৃতিবাদকে দেশজ জনগণের উপর উদারবাদী অভিজাতদের চাপিয়ে দেওয়া নীতি বলে মনে করে দক্ষিণপন্থী লোকবাদ। আমাদের দেশে নাগরিকপঞ্জির নীতি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মধ্যে এই দক্ষিণপন্থী লোকবাদী রাজনীতির রেশ প্রবল যেখানে নাগরিকপঞ্জির নীতি প্রধানত একটি ভাষাগত জাতিকে 'বিদেশি' বলার প্রক্রিয়াকে দৃঢ় করে তাদের তাড়াবার তাল করছে আর নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মধ্যে দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বকে নির্ণয় করার প্রচেষ্টা চলছে। জাতীয় স্তরে বর্তমানকালে মোদীত্বের রাজনীতি এই দক্ষিণপন্থী লোকবাদের দাবিগুলোকে সামনে রেখেছে আর আঞ্চলিক স্তরে শিবসেনার জন্মই হয়েছিল এই দক্ষিণপন্থী লোকবাদী রাজনীতির দাবিগুলোকে ভিত্তি করে।

লোকবাদ ও রাজনীতি

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন উদাহরণের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে লোকবাদী রাজনীতিতে সফল হয়েছে। বলা যেতে পারে জনপ্রিয়তাবাদ ছাড়া তাদের ওই সফলতা যথাযথ বিশ্লেষণ করা যাবে না। তাদের মতাদর্শ আলাদা হতে পারে, তাদের দাবিগুলো একে অপরের থেকে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু লোকবাদী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার 'সমানতার যুক্তি' যেখানে বেশ কিছু অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবিকে একযোগে বেঁধে একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতাসীন বৃত্ত/শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই— ওই প্রত্যেকটা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পিছনে কাজ করেছে। কিন্তু একটি জনমোহিনী রাজনীতি সফল হবার পরে তা টিকে থাকে কী করে? আরও স্পষ্ট করে বললে শাসক হবার পর লোকবাদী দল নির্বাচনি রাজনীতির ময়দানে কী করে ক্ষমতা ধরে রাখে?

বিভিন্নতার যুক্তির মাধ্যমে শাসক যতদিন বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে পূরণ করার সামর্থ্য রাখবে এবং শাসন প্রণালীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কল্যাণের প্রকল্প ও জনবাদী/জনমুখী নীতি অবলম্বন করার প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়ন করার অবস্থায় থাকবে ততদিন শাসকের শাসন দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা প্রবল। এই নীতি নিয়ে বাংলায় যেমন ৩৪ বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল, পাশের রাজ্য ওড়িশাতে একটি আঞ্চলিক দল দুই দশকের উপর শাসনক্ষমতা ধরে রাখতে পারল। অন্যদিকে শাসককে ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে যে তার বিরুদ্ধে জনপ্রিয় দাবিকে সামনে রেখে এক নতুন জনতার যাতে না উত্থান হয়। বরং শাসক এমন একটি জনতার নির্মাণ করবে যা

বিরোধীপক্ষকে আসলে দুশমন বলে মনে করবে। এই দুই প্রক্রিয়া যেখানে সমান্তরালভাবে দীর্ঘ হয়েছে সেখানে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মেয়াদ দীর্ঘ হয়েছে। যেখানে এবং যখন এই প্রক্রিয়াগুলোর সীমাবদ্ধতা দেখা গেছে তখন দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে।

তবে এখানে প্রয়োজনীয় কথা হল রাজনীতির প্রক্রিয়া কোনো স্বয়ংক্রিয় চালিকাশক্তি নয়। অর্থাৎ অনেকগুলো অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবিকে একসঙ্গে বেঁধে জনপ্রিয় দাবিতে উত্তরণ ঘটানো স্বয়ংচল অবস্থায় হয় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক লড়াই, আন্দোলন এবং দাবির মধ্যে যোগাযোগ ও মৈত্রী ঘটানো একটি পরিকল্পনামাফিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফল। তাই বস্তুগত অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু অপূর্ণ দাবি থাকলেই তা স্বয়ংক্রিয় হয়ে সরকারবিরোধী জনপ্রিয় দাবিতে পরিণত হয় না। গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে একযোগে বেঁধে ক্ষমতাসীনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছোড়ার মতো জনপ্রিয় দাবিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে একটি কঠিন রাজনৈতিক অনুশীলনের প্রয়োজন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে শাসকবিরোধী বৃহত্তর গণআন্দোলনের একটা ভূমিকা থাকে। এই কথা আমরা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন বা ২০১৬ সালের পশিচমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন থেকে পরিষ্কার জানতে পারি যে কী করে বিরোধীশক্তি ওই নির্বাচনগুলোয় ধরাশায়ী হল যদিও অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবি এবং শাসকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ কিছু কম ছিল না। তাই ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে 'ফের একবার মোদী সরকার' বা ২০১৬ সালে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে 'জনগণের ক্ষমতা তাই বাংলায় চাই মমতা' নামক স্লোগান একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রচারের মধ্য দিয়ে জনপ্রিয়তা পেল এবং মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারল।

উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কসের পুঁজিবাদ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ ছিল যে পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্য দিয়ে সামাজিক কাঠামোর একটা সরলীকরণ হবে যেখানে প্রধানত পুঁজি আর প্রলেতারিয়েত (কারখানা শ্রমিক) সমাজের মুখ্য শ্রেণি হিসেবে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং তাদের মধ্যে বৈরিতার ফলস্বরূপ, সংখ্যাধিক্য প্রলেতারিয়াতের রাজনৈতিক জয় থেকে পুঁজিবাদকে উত্তরণ করা সম্ভব হবে। বিংশ শতাব্দী এবং একবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেল যে একদিকে পুঁজিবাদ আর অন্যদিকে নির্বাচনি গণতন্ত্র যত বিকশিত হয়েছে, সামাজিক কাঠামো আরও জটিল হয়েছে ও শাসনপ্রক্রিয়া নিত্যনতুন কৌশলের মধ্য দিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করেছে। প্রলেতারিয়াত বলতে উনবিংশ শতাব্দীতে যাদের ভাবা হত তাদের সংখ্যা আজ বিশেষ বাড়ছে না। অনেক রাষ্ট্রে তা বরং কমছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে এমন অসংখ্য জীবিকা ও পেশা তৈরি হচ্ছে যাদের ঠিক প্রলেতারিয়াত বলা যায় না। অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর সমাজ তৈরি হয়ে গেছে আর আগামী দিনে রোবটিক এবং কৃত্রিম বুদ্ধির জগৎ আসতে চলেছে যেখানে মানব শ্রমিকের আরও অনেক বেশি কাজ মেশিন করবে। এহেন অবস্থায় বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের প্রভাব শুধু শ্রমিক শ্রেণির উপরে পড়ে না বরং সমাজের বিভিন্ন অংশের উপরে পড়ে— কৃষিজীবী, অরণ্যজীবী, মধ্যবিত্ত পেশাদার, ছোটো কারখানার মালিক, ছোটো ব্যবসায়ী ইত্যাদি। বর্তমান পৃথিবীতে আর্থিক বৈষম্য বাড়ছে কিন্তু যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে তাদের সবাই শ্রমিক নয়। একইসঙ্গে মানুষের মধ্যে এমন অনেক পরিচিতি সত্তা আছে যা সবসময় ব্যক্তিকে নিছক শ্রমিক হিসেবে নিজেকে দেখা বা চেনার থেকে লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, জাত ইত্যাদির সঙ্গে একাত্ম হবার প্রবণতা বা সেইরকম কোনো অশ্রেণি পরিচিতি গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মবোধের সম্ভাবনা থাকে। এই বিভিন্ন অশ্রেণি গোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত বা তাদের অপূর্ণ দাবিসমূহকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের প্রেক্ষাপটে সমাজ আজ বহু গোষ্ঠী, শ্রেণি, পরিচিতি ও আর্থিক মানদণ্ডে বিভাজিত। রাজনীতির প্রধান কর্তব্য হল এই বহুধাবিভক্ত ও নানাধর্মী জনসংখ্যার মধ্যে একদিকে জনগণ আর অন্যদিকে ক্ষমতার বৃত্তকে মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা। পুরোনো ধাঁচের পার্টি আজ সমকালীন রাজনীতির বিভিন্ন দাবিকে একসঙ্গে চালিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্ণায়ক নেতার পার্সোনালিটি কাল্ট আবার কোনো ক্ষেত্রে কিছু পার্টির জোটবদ্ধ মোর্চা জনপ্রিয় হচ্ছে।

উদারবাদী ঘরানার 'এন্ড অফ পলিটিক' (রাজনীতির অবলুপ্তি) ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে পুঁজিবাদের জয়ধ্বনি স্লোগান 'এন্ড অফ হিস্ট্রি' (ইতিহাসের অবলুপ্তি) বা কমিউনিস্ট ঘরানার 'রাষ্ট্রের অবলুপ্তি' তত্ত্বের বিপরীতে থেকে উত্তর-মার্কসবাদী রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, লাকলাউ-এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে রাজনীতি এক জায়গায় থেমে থাকে না এবং রাজনীতির কোনো অন্তিম লগ্ন নেই। মানবসভ্যতা যতদিন থাকবে রাজনীতিও তার সঙ্গে বেঁচে থাকবে। পরিবর্তনশীল মানবসভ্যতার সঙ্গে রাজনীতিও সদা পরিবর্তনশীল। আর সেই পরিবর্তনশীল রাজনীতির সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে আছে পরিবর্তনকামী লোকবাদ ও জনপ্রিয়তাবাদ তা সে যে নামেই ডাকা হোক না কেন। রাজনীতি আর লোকবাদ একে অপরের পরিপূরক, মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তাই রাজনীতির সবথেকে বড়ো ও মৌলিক কার্য হল জনতার নির্মাণ। যে জনতা জনার্দন থেকে জনপ্রিয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতাকে মোকাবিলা করবে।

আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ ঊনবিংশ-বিংশ যুগ্ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৯ আশ্বিন ১৪২৬

অমিয়কুমার বাগচী নিত্যপ্রিয় ঘোষ আজিজুর রহমান খান
দেবেশ রায় সৌরীন ভট্টাচার্য পবিত্র সরকার মালিনী ভট্টাচার্য
অরুণ সোম সুভাষ ভট্টাচার্য অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় আশীষ লাহিড়ী
অর্ধেন্দু সেন মানসপ্রতিম দাস স্থবির দাশগুপ্ত যশোধরা রায়চৌধুরী
অমিতাভ গুপ্ত মইদুল ইসলাম মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র অমিতাভ রায়
সেমন্তী ঘোষ তৃষিতানন্দ রায়

মূল্য : ৫০ টাকা